wekvqb-g³evRvi-weivóxqKiY t wkívqb I RvZxq Dbqb-AMMwZ|

*‡gvt Rv‡b Avjg|

প্রাক কথন ঃ স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হলো। আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান দূস্তর। আকাঙ্খার অনেক কিছুই অপূর্ণ রয়ে গেছে। প্রতি পদে পদে আমাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে। বেদনাদায়ক হলেও স্বীকার করতে হবে––আমরা বিশ্বে এখনো একটি পশ্চাৎপদ দেশ রয়ে গেছি। লজ্জাস্কর হলেও মানতে হচ্ছে––পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের কলঙ্ক তিলক আজ আমাদের মাতৃভূমির ভালে শোভা পাচ্ছে। । আত্নগানিকর হলেও সত্য হলো––আমরা এখনো বিশ্বের একটি দরিদ্রতম দেশ। কিন্তু কেন?

জাতীয়তাবাদী চেতনা-আবেগে প্রচণ্ডভাবে উদ্বুদ্ধ ও ইস্পাতকঠিন ঐক্য নিয়ে একটি জাতি ইতিহাসের নজিরবিহীন ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেও কেন এগুতে পারলনা––বিগত সাড়ে তিন দশক ধরেও? এ প্রশ্ন অত্যন্ত মৌলিক ।

আধুনিক কালে সভ্য কিংবা উন্নত সমাজ বলতে আমরা এমন একটি সমাজের প্রতিরূপ কল্পনা করি, যে সমাজে মানুষের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত––আইনের শাসন বিদ্যমান––চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা অপ্রতিরোধ্য এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় কাঠামোটি দাঁড়িয়ে থাকবে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপর––শুধু ভোট প্রয়োগে নয়, রাষ্ট্রপরিচালনায় জনগণের কার্যকর অংশীদারিত্বে যার প্রতিফলন ঘটবে। একটি সভ্য বা উন্নত সমাজের উপরোল্লেখিত বৈশিষ্টসমূহ বস্তুতঃ উক্ত সমাজের উপরিকাঠামো (super-structure) । যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এ সকল বৈশিষ্ট বিকশিত হয়, সেটা হলো সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক ––তথা উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ও উৎপাদিত পণ্যের ভোগ ও বণ্ঠন ––সহজভাবে বললে উৎপাদিত পণ্যের মালিকানা কার নিয়ন্ত্রণে ও জনগণের তাতে হিস্যা কী ––রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিভাষায় তাহলো সমাজের ভিত্তি (Infra-structure) । সমাজ বিদ্যমান সে উৎপাদন সম্পর্কের উপরই বস্তুতঃ নির্ভর করে কোন সমাজের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদের হিস্যা। এ অর্থে রাষ্ট্রীয় মালিকানা––অন্তত তত্ত্বগতভাবে––রাষ্টীয় সম্পদে জনগণের অংশীদারিত্ব অধিকতর নিশ্চিত করে, যদি রাষ্টীয় কর্তৃত্ব জনগণের হাতে থাকে। স্বাধীনতা-উত্তর বাঙলাদেশে সকল শিল্পকারখানা, ব্যাংক-বীমা ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরকারী করণের প্রেক্ষিতটাকে দেখতে হবে এ তত্ত্বগত আলোকে। একথা আজ খুব একটা বুঝিয়ে বলতে হবেনা যে, দারিদ্র্য আর উন্নয়ন যেমন পরস্পর বিরোধী, তেমনি দারিদ্র্য আর মৌলিক অধিকার কিংবা দারিদ্র্য আর গণতন্ত্রও পরস্পর বিরোধী অবস্থা। একটু তলিয়ে দেখলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব–– দারিদ্র্য আর স্বাধীনতা ও পরস্পর বিরোধী প্রপঞ্চ (Contradictory state of a society)––যার একটি অপরটিকে নাকচ করে। পৃথিবীতে আমাদের মত অনেক দেশ আছে, যারা রক্তমূল্যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলেও চরমভাবে দারিদ্র্যক্লিষ্ট। ফলতঃ তাদের সে স্বাধীনতা তাদেরকে গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার কিছুই দিতে পারেনি। আবার বিষয়টিকে উল্টোভাবেও বলা যায়। যে সমাজে সভ্যতা কিংবা আধুনিকতার উপরোক্ত বৈশিষ্ট সমূহ অনুপস্থিত, সে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হওয়া সত্ত্বেও একটি আধুনিক উন্নত সমাজ কাঠামো নির্মাণ করতে পারেনা। প্রাকৃতিকভাবে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তার জ্বলন্ত উদাহরন––যাদের অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী হলেও শাসন কাঠামো, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, বিচার ব্যবস্থা বস্তুতঃ এখনো মধ্যযুগীয়।

এখন প্রশ্ন হলো কী ভাবে একটি সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠবে?

যে কোন সচেতন নাগরিক মাত্রই জানেন যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করা ছাড়া সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। সে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র হলো মাত্র দু'টি; কৃষি আর শিল্প। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ মূলতঃ এমন একটি কৃষিপ্রধান দেশ, যার ৭৫ শতাংশেরও বেশী জনগোষ্ঠী ছিল সরাসরি কৃষি নির্ভর। স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যক্তিমালিকানাধীন কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খা বা চেতনাকে সামনে রেখে সেদিন শোষনহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজই ছিল জাতির স্বপ্ন । তাই স্বাধীনতার অব্যবহিত পর আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে সামনে রেখে দেশের তাবৎ ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হয়। একটি শোষণহীন সমাজ বিনির্মাণে এটা যে একটি প্রাথমিক এবং মৌলিক পদক্ষেপ অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়া পশ্চিমা শিল্পপতিদের ফেলে যাওয়া শিল্পকারখানার মালিকানা সরকারের অধিগ্রহণ করা ছাড়া তখন কোন বিকল্পও ছিলনা। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিত। সমকালীন তৃতীয় বিশ্বের প্রগতিশীল বাম ও সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় মুক্তির কর্মসূচীর প্রধান ঝোঁক ছিল অধনবাদী বিকাশের পথে (by passing capitalism) সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ। এটা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে, একটি পেটিবুর্জোয়া সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ, স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে আন্তর্জাতিক শত্রু-মিত্রের মেরুকরণের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রকে দলীয় কর্মসূচী হিসাবে

গ্রহণ করে। ফলতঃ স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ স্বাভাবিকভাবেই বৃহৎ-ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প-কারখানা ও ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণ করেন। বিষয়টি নিয়ে খোদ সমাজতন্ত্রীদের অনেকের মধ্যে বিতর্ক ছিল এবং শিল্প-কারখানার ঢালাও রাষ্ট্রীয়করণকে অনেকে সেদিন রাষ্ট্রীয় পুজিঁবাদ বলে সমালোচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, কেবল শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করলে যেমন সমাজতন্ত্র হয়না, তেমনি আবার সমাজতন্ত্র করতে হলে শিল্প-কারখানার মালিকানা রাষ্ট্রকর্তৃক অধিগ্রহণ ছাড়াও কোন বিকল্প নেই । তাই জাতীয়করণকে মহামতি লেলিন সমাজতন্ত্রের তোরণদ্বার (threshold of socialism) বলেছেন। পথ ও মত নিয়ে তত্ত্বগত বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, একটি বৃহৎ রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পখাত নিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অভিযাত্রা, এটাই হলো ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

<u>রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পের সংকট</u>

রাষ্ট্রায়াত্ত্বকরণের পর তৎকালীন সরকার ব্যবস্থাপনার তিন স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো তৈরী করল। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রশাসন, কর্পোরেশন ও মন্ত্রণালয়, এ তিন স্তর বিশিষ্ট প্রশাসন বস্তুতঃ প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনাকেই বিপর্যস্থ করে তুলল। মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আবার সেক্টর কর্পোরেশন, রাষ্ট্রায়াত্ত্ব শিল্প বিভাগ ও শিল্প ইউনিট --এ তিনটি বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব নিয়ে টানা-পোড়ন সৃষ্টি হলো। গতানুগতিক একটি সরকারী অফিসের মত চলতে লাগল একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত শিল্পের প্রাক্তন মালিকেরা শিল্পের উন্নয়ন অগ্রগতির পরিবর্তে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় মেতে উঠল। নগদ টাকা, কাঁচামাল, এমনকি শিল্পের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত তারা আত্মসাৎ করা শুরু করল। কতিপয় দুর্নীতিবাজ শ্রমিক নেতারাও তাদের এ দুষ্কর্মের শরীক হলো। '৭৪ এর শেষ পর্যন্ত সরকার কোন শ্রমনীতি ঘোষণা করতে পারলনা। ফলতঃ শ্রমিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও চরম বিশৃংখলা দেখা দিল। অনেক শিল্প কারখানার উৎপাদন স্তর '৬৯-৭০ সালের নীচে চলে গেল। পাট শিল্প লোকসানের মুখোমুখী হলো। মোদ্দাকথা হলো, বিরাট রাষ্ট্রীয়খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যবস্থাপকের অভাব, প্রাক্তণ শিল্প মালিকদের উপর অধিগ্রহণকৃত শিল্প-কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ, তিন স্তর ভিত্তিক প্রশাসন, কাঁচা মালের ঘাটতি, বণ্ঠন ব্যবস্থায় ত্রুটি ও দুর্নীতি প্রভৃতির ফলে জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানা যাত্রা লগ্নেই বিপর্যয়ের মুখোমুখী হল। তবে <u>ইঞ্জিনিয়ারিং ও বস্ত্র শিল্পে উৎপাদন মাত্রা '৬৯-৭০ সালের চেয়েও বেশী ছিল</u>। যেমন বাংলাদেশ টেক্সটাইলস মিলস কর্পোরেশনের আওতাধীন ৬টি, বাংলাদেশ ফুড এ্যাণ্ড সুগার কর্পোরেশনের আওতাধীন ২১ টি, ক্যামিক্যালস কর্পোরেশনের আওতাধীন ১৬টি, ষ্টিল এ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশনের আওতাধীন ১৯ টি, মোট ৬১টি শিল্প কারখানা ছিল লাভজনক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণের পর অনেকে তাদের সে লাভজনক অবস্থা ধরে রাখতে শুধু ব্যর্থ হয়নি, অনেকগুলো বন্ধও হয়ে গিয়েছে (সূত্র-privatisation in Bangladesh, by Rehman Sobhan)। হয়ত রাষ্ট্রায়াত্ত্ব শিল্পের উপরোক্ত বিপর্যয়গুলো পরবর্তী সময়ে সরকার লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গৃহীত দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠদে পারত। কিন্তু পচাঁত্তরের পট পরিবর্তন সম্ভাবনার সে দ্বার রুদ্ধ করে দিল।

<u>weivóxqKi‡Yi mPbv I djvdjt</u>

১৯৭৪ ইং সালের দিকে জাতীয়করণকৃত শিল্প কারখানা ও ব্যাংক-বীমা পূণঃ ব্যক্তিমালিকানায় প্রত্যার্পনের সমর্থনে একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী গোষ্ঠী সোচ্চার হয়ে উঠলেও বস্তুতঃ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত কোন শিল্প কারখানা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়নি। কেবল ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের শিলিং ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ইং সালের ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে তারা জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের গতিমুখ পাল্টে দেয়। অর্থনৈতিক বিকাশের পুঁজিবাদী পথকেই তারা সর্বরোগের ধন্বন্তরী মহৌষধ মনে করল। মায়ের অজ্ঞতাপ্রসূত অযত্ন-কাতর শিশুটিকে তুলে দেওয়া হলো সৎমাতার ক্রোড়ে। সঙ্গত কারণেই এবার সরকারীভাবেই প্রচারণা শুরু হলো রাষ্ট্রায়াত্ত্ব শিল্পকারখানার বিরুদ্ধে। সরকারের আমদানী-রপ্তানী ও শুল্কনীতি রাষ্ট্রায়াত্ত্বখাতকে ব্যক্তিখাতের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় নিক্ষেপ করলো। ফলতঃ লোকসান বাড়তে লাগল রাষ্ট্রায়ত্ত্বখাতের। শুরু হলো বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া। বিভিন্ন শিল্পকারখানা অত্যন্ত সুলভমূল্যে তুলে দেওয়া হতে লাগল বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে। ৮০ এর দশকে বিরাষ্ট্রীয়করণ সর্বোচ্চমাত্রা লাভ করে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ ইং সাল পর্যন্ত কাল পর্বে উন্নয়ন অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০০০(এক হাজার) কোটি টাকার ঋন ও বিরাষ্ট্রীয়করণের ও পুজিঁ প্রত্যাহারের মাধ্যমে ১০০০(এক হাজার) কোটি টাকার পরিসম্পদ তুলে দেওয়া হয়েছে কতিপয় ব্যক্তির হাতে।(বাংলাদেশে পুজিঁবাদী বিকাশের সংকট--রেহমান সোবহান ও ডঃ বিনায়ক সেন।) বলাবাহুল্য এ প্রক্রিয়া বিগত আওয়ামী শাসন আমল হয়ে বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকার পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

<u>A_©bwZK †¶‡Î G g³bxwZ I XvjvI weivóxqKi‡Yi bxU djvdj `vovj wbb¥iƒct</u>

ক) রাষ্ট্রায়াত্তখাতের পাঁচ শতাধিক শিল্পকারখানা ব্যক্তি মালিকেরা ফেরত ফেল।

খ) বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোটাই হস্তান্তরিত হলো ব্যক্তি খাতে।

গ) যে সমস্ত শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান জাতীয় অর্থনীতিতে স্পর্শকাতর ভূমিকা রাখার জন্য এমনকি অগ্রসর পুজিঁবাদী দেশেও বক্তিমালিকানায় রাখা নিরাপদ মনে করা হয়না, যেমন বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস, রেল ইত্যাদি সেক্টরকেও ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলো ।

ঘ) সার ও কীটনাশক ঔষধসহ কৃষি উপকরণের উপর থেকে ভর্তুকী প্রত্যাহার , কৃষিঋণ বিতরণে দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং সামগ্রিকভাবে সরকারের ধনিক ও শহর অভিমুখী উন্নয়ন প্রয়াসের ফলে গ্রামীণ দারিদ্র পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করল ।

নীট ফলাফল দাঁড়াল--ব্যক্তি খাতে হস্তান্তরিত পাঁচ শতাধিক শিল্পকারখানার ৬০% বর্তমানে অস্তিত্বহীন এবং বাকী ৪০% রুগ্ন হয়ে আছে । বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎ করেও শিল্পকারখানা গড়ে তুলছেনা তথাকথিত ঋণখেলাফী উদ্দ্যোক্তারা । বরং উক্ত ঋণের টাকার সিংহভাগ পাচার হয়ে গেছে বিদেশে । উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলাচনা থেকে আমরা কি এ অনুসিদ্ধান্তে পৌছতে পারিনা, মুক্তবাজার অর্থনীতির যে লাগামহীন ঘোড়ায় জাতিকে সওয়ার করানো হয়েছিল এগিয়ে যাওয়ার সোনালী স্বপ্ন নিয়ে, মুক্ত বাজার অর্থনীতির চোরা বালিতে সে ঘোড়া বহু পূর্বেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে ।

<u>সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ ঃ তেল ও গ্যাস সেক্টরে বহুজাতিকের শ্যেন দৃষ্টি</u>

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ইরাক দখল এবং ইতিপূর্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আফগানিস্তানে হামলা এবং সে দেশে একটি শিখন্ডি সরকার স্থাপনের ঘটনার মর্ম (Essence) উপলব্ধি করতে হলে দেড় দশক ধরে World Bank, IMF Ges WTO কর্তৃক পরিচালিত গোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের প্রেক্ষিত, লক্ষ্য ও ফলাফল বিশেশষণ করতে হবে । বিশ্বায়নের মূল কথা হলো সব কিছু সবার জন্য উম্মুক্ত করে দাও । লক্ষ্য, বাজারে অবাধ প্রবেশের সুযোগ । সে সুযোগ, বলাই বাহুল্য, অবারিত হয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্যই । উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত দেশ কিভাবে প্রতিযোগিতা করে বাজারে ঢুকবে ? তাছাড়া পশ্চিমা সাম্রজ্যবাদী দেশগুলো বিশ্বায়নের নামে অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর বাজার দখল করলেও তাদের বাজারে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা টিকই বহাল রেখেছে বিভিন্ন কোটা ব্যবস্থার মাধ্যমে । তারা তাদের দেশে শিল্প ও কৃষিতে ঠিকই ভর্তূকী দিচ্ছে; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সেক্ষেত্রে ভর্তূকী প্রত্যাহার করতে বাধ্য করছে । ফলতঃ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিগত দেড় দশক ধরে পরিচালিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অনুন্নত দেশ সমূহ আজ তাদের জাতীয় সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর হাতে তুলে দিয়ে আরো গরীব ও নিঃস্ব হয়েছে । বিশিল্পায়নের ফলে সে সকল দেশে বেকারত্ব বেড়েছে প্রকট ভাবে । জনসেবা মূলক খাতগুলোর মালিকানা ব্যাক্তিখাতে হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে জনগণের দুর্ভোগ সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে । একদিকে ধনী দেশগুলো আরো ধনী হয়েছে এবং গরীব দেশগুলোর দ্রারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছে । একইভাবে দেশগুলোর অভ্যন্তরেও ধনী দরিদ্রের বৈষম্য তীব্র হয়েছে । এ গোবালাইজেশনের আড়ালে বহুজাতিক কোম্পানী সমূহের একচেটিয়া পুঁজির দৌরাত্ম্য সীমাহীন পর্যায়ে চলে গেছে । তেল গ্যাস হতে শুরু করে বিদ্যুৎ, রাবার, ক্যামিকেল, পেপার, ঔষধ, সিমেন্ট, খনিজ সর্বক্ষেত্রে বহুজাতিক একাধিক কোম্পানী এক একটি কোম্পানীতে একীভূত হয়ে এক একটি মেঘা কর্পোরেশনের জন্ম দিচ্ছে, যেগুলো অর্থনৈতিক দৈত্যরূপে বিশ্ব বাজারে আবির্ভূত হচ্ছে । ব্যাংকগুলো একীভূত হয়ে একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির (Financial Oligarchy) জন্ম দিচ্ছে । জ্বালানী তেলের ক্ষেত্রে নিকট অতীতে যে সকল বহুজাতিক কোম্পানী ব্যবসা করত তাদের মধ্যে ১০ টি কোম্পানীকে বলা হত Top Ten এবং তৎমধ্যে ৭টি কোম্পানীকে বলা হত " Seven Sister" যারা বিগত কয়েক দশক ধরে জ্বালানী তেলের ব্যবসায় প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল । কিন্তু এ সকল কোম্পানী সমূহ সম্প্রতি একীভূত হয়ে তিনটি মেঘা কর্পোরেশন --- Exxon/Mobil, Royal Dutch Shell এবং BP/Amoco হিসাবে জন্ম লাভ করেছে । এ তিনটি মেঘা কর্পোরেশনের যৌথ বিক্রয় অপর ১৬ টি কর্পোরেশনের যৌথ বিক্রয়ের চেয়ে বেশী । এ তিনটি মেঘা কর্পোরেশনের বৎসরে যৌথ বিক্রয়ের পরিমাণ ৪১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ১০০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের বার্ষিক জিডিপিকে ছাড়িয়ে যায় । বিশ্ব অর্থনীতিতে এ পরিবর্তন বিশেষ ভাবে দৈত্যাকার মেঘা কর্পোরেশনের আবির্ভাব বিশ্ব রাজনীতিতেও গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করেছে । তথাকথিত নিউ-গ্লোবালাইজেশন, উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোতে তার ধারাবাহিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আনুপূর্বিক ঘটনার ব্যাখ্যা করলে সহজে উপলব্ধি করা যাবে যে, <u>১৯৯১ ইং সালে ইরাকে মার্কিন হামলা, ২০০১ ইং সালে আফগানিস্তান দখল এবং সেখানে একটি শিখন্ডি সরকার বসানো এবং সর্বসম্প্রতি ইরাক দখল এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশ সমূহের তেল গ্যাস কোম্পানী সমূহ deregulation এর নামে ব্যাক্তি খাতে হস্তান্তরের বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসক্রিপশান সবকিছুর কার্যকারণ অভিন্ন ও একইসূত্রে গাঁথা, সে মেঘা কর্পোরেশন তথা একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির স্বার্থ রক্ষা । আমদের জাতীয় সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস অসম উৎপাদন-বন্ঠন চুক্তির মাধ্যমে সেই বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের হাতে তুলে দেওয়ার পাঁয়তারা এবং লাভজনক তেল বিপণন কোম্পানী সমূহ বিক্রি করে দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের কার্যকারণও কিন্তু খুজঁতে হবে এখানেই ।</u> বিশ্বের তেল সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য ঐ সকল মেঘা কর্পোরেশনের স্বার্থের বরকন্দাজ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

প্রয়োজনে আরো দেশ দখল করবে এবং এ কাজে তার ছল ছুতোর কোন অভাব হবেনা। এ প্রসঙ্গে দঃ এশিয়া মানবাধিকার সংগঠনের চেয়ারম্যান ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল অতি সপ্রতি বাংলাদেশে তাদের এক প্রতিনিধি সভায় যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখ করছি---"the ominous shadow of the post Iraq war is creeping in our direction and the purpose of neo-imperialism is not confined to acquisition of Oil source only but is also re-establish years of hegemony. তিনি আরো বলেন--- It is time that we take our destiny in our hands and assert that no war will be fought on the soil of South Asia and the sacred soil of our ancient land will never witness the murder of innocents by the terrorist.(The Daily Star,27th April,03) অবশ্য এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে স্বয়ং আমেরিকার বক্তব্য পাওয়া গেছে। গত ২৮শে এপ্রিল, ২০০৩, কাতারে আমেরিকার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড কোনরূপ রাখ ঢাক না করেই বলেছেন, "আমেরিকার রাজনীতি এখন এক নোতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে, আমেরিকা এখন তার নিরাপত্তার জন্য হুমকী সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী দেশকে চিহ্নিত করে আগেই আক্রমণ করে পরাস্ত করবে (Preamtive War Theory) এবং আফগানিস্তান ও ইরাকের ক্ষেত্রে আমাদের এ নীতি অত্যন্ত সফল হয়েছ ।" বলাবাহুল্য এ নতুন যুগ হলো আমেরিকার সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ। এখানে বার্তাটা অত্যন্ত পরিস্কার, আমেরিকা যখন যে দেশকে দখল করা প্রয়োজন মনে করবে, তাকে তার নিরাপত্তার জন্য হুমকী মনে করে দখল করে নিবে। বাংলাদেশ কোন তেল উৎপাদনকারী দেশ নয়। আভ্যন্তরীন চাহিদা মেটানোর জন্য সম্পূর্ণ আমদানী নির্ভর কয়েকটি বিপণন কোম্পানী ও একটিমাত্র শোধনাগার নিয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন নামে তার একটি সেক্টর কর্পোরেশন আছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও তার অঙ্গ প্রতিষ্টানসমূহ দেশে জ্বালানী তেল উৎপাদন, আমদানী ও বিতরন করে থাকে। বিগত ১৯৯১-৯২ অর্থ বৎসর হতে ২০০১-২০০২ অর্থ বৎসর পর্যন্ত বার বছরে বিপিসি, লভ্যাংশ সহ বিভিন্ন কর,সারচার্জ ও ভ্যাট বাবদ মোট সর্বমোট ২৪৩৬৫.৫৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ গড়ে বৎসরে ২০৩০.৪৬ কোটি টাকা।

বিপিসি,র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এল,পি, জি, এসএওসিএল প্রভৃতি বিপণন কোঃ গুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সারা দেশে জ্বালানী তেল ও এলপি গ্যাসের সরবরাহ অক্ষুন্ন রেখেছে। জাতীয় বিমান সংস্থা বাংলাদেশ বিমান সহ সকল আন্তর্জাতিক বিমান, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে এ প্রতিষ্ঠানগুলো জ্বালানী তেল সরবরাহ করে থাকে, যেখানে গুণগত মান নিয়ন্ত্রন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের দক্ষ বিতরণ ব্যবস্থাপনার কারণে '৯১ এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাসের পরও সারা দেশে জ্বালানী তেলের সরবরাহ যেমন অক্ষুন্ন ছিল, তেমনি তার মূল্য নিয়ে কোন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইরাক দখল পরবর্তী পরিস্থিতিতেও জ্বালানী তেলের মূল্যের কোন প্রবৃদ্ধি ঘটেনি, কেবল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল বিপণন কোম্পানী গুলোর দক্ষতার কারণে, যা তেল ব্যবসা ব্যক্তিখাতে থাকলে অনিবার্য ছিল। । এ বিপণন কোম্পানীগুলো সারা দেশে জ্বালানী তেল বিতরন করে থাকে সামান্য কমিশনের বিনিময়ে। তারপর ও এসমস্ত কোম্পানীগুলো নিজদেরকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। দেশের একমাত্র জ্বালানী তেল শোধণাগার ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ দেশে জ্বালানী তেলের চাহিদার একটি উলেখযোগ্য অংশ প্রতি বছর পরিশোধনের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করে আসছে। কিন্তু তেল বিপণন কোম্পানীগুলো ব্যক্তিখাতে হস্তান্তরিত হলে ইস্টার্ন রিফাইনারী লিঃ অবশ্যই বন্ধ হয়ে যাবে, যদিও কৌশলগত কারণে সরকার তা বিক্রির কথা আপাতত বলছেনা।

এমতাবস্থায় রাষ্ট্রায়াত্ত এ তেল সেক্টর ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত হলে পরিণাম ফল কী হবে––

- *সরকার প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে।*
- *সারাদেশে জ্বালানী তেল সরবরাহের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবেনা, ফলতঃ অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে সরকার ও জনগণ জিম্মি হয়ে পড়বে।*
- *জ্বালানী তেলের গুণগতমান ক্ষুন্ন হবে, (লুব্রিকেন্টের ক্ষেত্রে যা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।) ফলতঃ কলকারখানা যন্ত্রাংশ নষ্ট হবে, পরিবহন শিল্প ধ্বংসের মুখোমুখী হবে।*
- *সাধারণ মানুষ ন্যায্য মূল্যে জ্বালানী তেলের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হবে।*
- *জ্বালানী তেলের বাজারে প্রায়শঃ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হবে, মুনাফার লোভে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কৃষি উৎপাদনে, পণ্য পরিবহনে এবং অনিবার্যভাবে সকল দ্রব্যমূল্যেও।*
- *সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তা হুমকীর মুখোমুখী হবে।*
- *সর্বশেষ, তবে কমগুরুত্বপূর্ণ নয়, তাহলো কয়েক সহস্র মানুষ তাদের চাকুরী হারাবে।*

অতএব জাতীয় স্বার্থে সরকারের এ গণবিরোধী উদোগ জাতীয় স্বার্থে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

** মোহাম্মদ জানে আলম*
গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক,
গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি।

তথ্য সূত্রঃ ইন্টারনেট

1.ICEM documents, by Vic Thorpe, ICEM, Brussels.
2.The 3rd Oil War, Geology and Geopolitics, by Tushar K Sarkar
3.People's movement and alternative, by Sukomal Sen.
4.Blood Thirsty War for Iraq's Oil, Dr. M.K.Pandhe. General Secretary, CITU, New Delhi.
5. Energy Reserves, Refining and Technology, Prospect and challanges,
by Swadesh Dev Roye, Secretary, CITU. New Delhi.